গোরার সময়

প্রসূন ঘোষ

'দস্তয়েভস্কির সাহিত্য ও তার সমস্যা' প্রবন্ধে মিখাইল মিখাইলোভিচ বাখতিন 'কণ্ঠস্বরের নানাত্ব' ('Plurality of voices') তত্ত্বটির উপস্থাপনায় বলেছিলেন যে নানা কণ্ঠস্বরের সমবায়ে এটি গঠিত হলেও প্রতিটি কণ্ঠস্বরই মৌলিক, নিজস্ব, স্বয়ংনির্ভর এবং এই ধরনের বহু কণ্ঠস্বরের সম্মিলন উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অর্থাৎ, কেবলমাত্র প্রধান চরিত্র বা নায়ক চরিত্র নয়, প্রত্যেক চরিত্রের কণ্ঠস্বরেরই স্বতন্ত্র মূল্য আছে। আবার, কোন কণ্ঠস্বর ঔপন্যাসিকের কণ্ঠস্বর নিরপেক্ষ, এমনকি বৈপরীত্যমূলকও হতে পারে। বরং, মহৎ উপন্যাসে চরিত্রগুলি গড়ে ওঠে নিজস্বতায়, লেখকের অঙ্গুলি সংকেতে নয়, তারা স্রষ্টার মমতায় লালিত হয়েও অধীনত নয়, তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বনির্ভরতায় এবং বহু কণ্ঠস্বরের বুনোটে সমগ্র কাঠামো নির্মিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত 'গোরা' উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায়, ১৩১২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা থেকে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত একনাগাড়ে, আর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ঐ ১৩১৬ বঙ্গাব্দেই অর্থাৎ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। গোরা, বিনয়, সুচরিতা, হারান, ললিতা, পরেশ, কৃষ্ণদয়াল, আনন্দময়ী, বরদাসুন্দরী, মহিম, কৈলাস, অবিনাশ-প্রত্যেকেই মূর্তিমান বিগ্রহ; অবিরত বাক্যবাণ বর্ষণের দ্বারা নিজ কণ্ঠস্বরকে চিনিয়ে দিয়েছে আর সেই সঙ্গে একটা যুগের টলায়মানতা, যুগমানসের প্রতিভূদের নানা ভাবসংঘাত, সমাজের তরঙ্গোদ্বেলতা, ধর্ম ও চিন্তার নানা সংঘর্ষ উপন্যাসটির আধার। উপন্যাসের প্রারম্ভেই রয়েছে রৌদ্রকরোজ্জ্বল কলকাতার প্রভাতের উল্লেখ। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখি—"কলেজে পাস করা যখন একটাও আর বাকি রহিল না ওখন এই ছাতের উপরে মাসে একবার করিয়া যে হিন্দুহিতৈষী সভার অধিবেশন হইয়া আসিয়াছে এই দুই বন্ধুর মধ্যে একজন তাহার সভাপতি এবং আর একজন তাহার সেক্রেটারী।"১ এবং এই পরিচ্ছেদে আরও দেখি গোরা বিনয়কে বলেছে অবিনাশের ব্রাহ্মদের প্রতি নিন্দার কথা। হিন্দু হিতৈষী সভা কিংবা ব্রাহ্মদের নিন্দা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধকেই চিনিয়ে দেয়। 'মিউটিনি'-র পরে-পরেই গোরার জন্ম অর্থাৎ ১৮৫৭ সমকালীন সময়েই তার জন্ম। উপন্যাসের শুর দিকে দেখি, গোরা কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে যায়, বরদাসুন্দরীও বলেছেন যে বিনয়কে তিনি সমাজে দেখেছেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যু ঘটেছিল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, সুতরাং এ ঘটনা তার পূর্বের। কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ ক'রে গোরা হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেছে। বেদ-পুরাণের পুনর্বিচার ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নতুন ক'রে শু হয়েছিল—রামকৃষ্ণের ভাবশিষ্যরা হিন্দু পুনর্জ্জীবনবাদে (Hindu revivalism) বিশ্বাসী ছিলেন, বঙ্কিমের সাহিত্য, গিরিশ ঘোষের নাটকে সে প্রমাণ রয়ে গেছে। রবিবারে কেশববাবুর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল বিনয় এবং সেখানেই পরেশবাবুদের সঙ্গে তার দেখা হয়। উপরন্তু, পরেশবাবুর বাড়িতে যীশুখ্রীষ্টের রঙিন ছবির সঙ্গে কেশববাবুর ছবিটিকেও দেওয়ালে টাঙানো অবস্থায় দেখে বিনয়। অর্থাৎ, কেশবচন্দ্রের ভাবপরিমণ্ডলে বিরাজিত বাঙালি ভক্তশিষ্যদের মধ্যে একসময় যেমন গোরা ও বিনয় ছিল, তেমনি পরেশবাবুরাও সেই বৃত্তভুক্ত ছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের প্রতি এই ভক্তির প্রকাশ কোন সময়ে? কিংবা পরেশবাবুরা কোন্ ব্রাহ্মসমাজের অংশীদার?

"Keshab organised the Brahmo youth in a council, the Brahmo women in a society. A split became unavoidable and, in 1866, Keshab broke away from the original church and founded the Brahmo Samaj of India."2

"The break came when Keshab allowed his own minor daughter to marry the chief of

Coochbehar under the old rites defying the new marriage conventions growing up within the church at his own instance....
The young Brahmos revolted and set up Sadharan Brahmo Samaj in 1878."৩
অর্থাৎ কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের অর্ন্তকলহ প্রকাশ্য রূপ নেয় ১৮৭৮ সালে, ঐ বছরেই সাধারণ ব্রাহ্মসম াজ প্রতিষ্ঠিত হয় আর ১৮৮১ সালে কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নববিধান ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত হয়। বিনয়ের সংলাপের একস্থানে আছে যে তার সব পড়া সমাপ্ত হয়ে গেছে। গোরা এবং বিনয় উভয়েই এম. এ. পাশ করেছে। যদি সিপাহী বিদ্রোহের পরে গোরার জন্ম হয় এবং এম. এ. পাশ করতে অন্তত একুশ-বাইশ বছর সময় লাগে ধরি, ত াহলে ঘটনাধারা যে ১৮৭৯-৮০-র পূর্বে ঘটতেই পারে না তা বলা যায়। অর্থাৎ, ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজ ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেছে এবং পরেশবাবুরা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত একথাও বলা যায়, যদিও নববিধান ব্রাহ্মসমাজ তখনও পুরনো ন ামেই পরিচিত ছিল।
সমালোচক বলেছেন ঃ "পরেশবাবুর পরিবার নববিধান ভুক্ত হইতে পারে না উহা স্পষ্ট। সুতরাং কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিবার সময়ে বরদাসুন্দরীর পক্ষে বিনয়কে দেখা সম্ভব হইতে পারে শুধু ব্রাহ্ম সমাজ বিভক্ত হইবার আগে।....গোরার প্র ারম্ভ১৮৭৮ সনের আগে হওয়া উচিত।"৪ এবং তাঁর আরও আপত্তি হল এই যে, গোরা এবং বিনয় দুই বন্ধুই সংব াদপত্রে সিভিল বিবাহ আইনের বিদ্ধে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছিল। বিনয় যখন ললিতার প্রেমে পড়ে এবং বিবাহের মনস্থ করে তখন তার পূর্বকৃত সমালোচনার কথা মনে পড়ে এবং অপরাধবোধেও ভোগে সে। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, সিভিল ম্যারেজ আইন হিসেবে প্রথম পাশ হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে "A civil Marriage Act was secured in 1872 to legalise unorthodox casteless marriages"৫ ঔপন্যাসিক লিখেছেন ঃ "কিছুকাল হইল সিভিল বিবাহ আইন পাশ হইয়া গেছে।" ১৮৫৭ সালের অব্যবহিত মুহূর্তে গোরার জন্ম ধরে নিলে তখন গোরার বয়স চৌদ্দ পনেরো এমন বলা যায়। অর্থাৎ প্রায় পনেরো বছর বয়সে গোরা বা বিনয় সংবাদপত্রে তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করেছিল। সমালোচকের মনে হয়েছে এতে উপন্যাস কাহিনীতে সময়ের অসংগতি ঘটেছে। কিন্তু এমনটা মনে করার যথেষ্ট হেতু নেই। কেননা, 'কিছুকাল হইল' অর্থাৎ সময় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দই নাও হতে পারে, কিংবা তার কতটা পরবর্তী সঠিকভ াবে জানা যাচ্ছে না। আবার, তৎকালে বিবাহের বয়ঃসীমার ক্ষেত্রে পনেরো যথেষ্ট বয়স। যদিও প্রগতিশীল পরিবারের অংশীদার, ঠাকুরবাড়ির মার্জিত আবহের লালক, তবুও দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র-কন্যাদের বিবাহ অল্পবয়সেই দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কম বয়সে বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁরও পুত্র-কন্যাদের বিবাহ হয়েছিল কম বয়সে। সুতরাং বিনয় বা গো রার তৎকালীন সময় অনুযায়ী ১৮৭২ সালেই বিবাহের উপযুক্ত বয়স হয়েছিল এবং সেই সময় সিভিল বিবাহ সম্বন্ধে ত াদের কৌতূহল স্বাভাবিক। এছাড়াও উপন্যাসে সম্যক ভাবে অবগত হই যে, তারা স্বাজাত্যবোধে পীড়িত, শিক্ষিত, প্রগতিশীলদের অন্যতম। সুতরাং প্রায় পনেরো বছর বয়সে যদি সিভিল বিবাহের বিপক্ষে তারা মতামত প্রকাশ করে তাতে অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয় না। তাছাড়া, ১৮৭৮ সালে কেশব-কন্যার সঙ্গে কুচবিহার যুবরাজের বিবাহ উপলক্ষে অ ারও একবার সংবাদপত্রে এ সংক্রান্ত চাপান-উতোর চলেছিল। হতে পারে, এই সময়েই তারা তাদের স্বাধীন মত প্রকাশ করেছিল।
আবার, কেশবচন্দ্র সম্পর্কে ঐতিহাসিকের মন্তব্যও স্মরণীয়ঃ "ইংরেজ সরকারের আনুগত্য তিনি অবশ্য পালনীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সর্বপ্রকার রাজনীতিক আন্দোলন বর্জন করিয়া চলিতেন।"৬ এছাড়াও, "রাণী ভিক্টো রিয়ার ভারত সম্রাজ্ঞী ('Empress of India') উপাধি গ্রহণে কেশবচন্দ্র পুলকিত হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জা নিয়েছিলেন, এবং সম্ভবতঃ ব্রিটিশ শাসনকে বিধাতার দান বলেও ঘোষণা করতেন।.... কিন্তু যে যুব-সম্প্রদায় তাঁর বাগ্মিতায় উন্মত্ত হয়ে পড়তেন এবং যাঁরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে গোপনে গোপনে যুক্ত হচ্ছিলেন, তাঁরা কেশবের এই ব্রিটিশ অনুরাগ কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন তার আনুপূর্বিক ইতিহাস জানা যায় না।"৭ পাঠকের মনে পড়বে, হারানও ব্রিটিশ শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করতেন, কেশবের খৃষ্ট আনুগত্যের চিহ্ রয়েছে পরেশবাবুর বাড়িতেই, যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যের নিদর্শন পাই না। ইংরেজ সরকারের আনুগত্যের পরিচয় বরদাসুন্দরীর পরিবার দিয়েছে। পরেশব াবু ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মূল্য দিয়েছেন, যদিও পরাধীনতার বিদ্ধে কখনোই চিন্তাগ্রস্ত হন নি। সুতরাং, পরেশবাবুর পরিবার কেশব অনুগত নববিধানভুক্ত, যদিও তখনও সে নামে এই সমাজ পরিচিত হয়নি এবং কেশবের নবপূজা ততটা অতিরঞ্জিত

আকার ধারণ করেনি। তাছাড়াও, উপন্যাসে সময়ের সংগতি আহত হওয়ার কারণস্বরূপ সমালোচক যখন 'নীলচাষ', 'সিভিল সার্ভিস' বা 'বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন' প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন, তখনও পূর্ণ সহমত পোষণ করা যায় না।৮ কারণ, গোরা গ্রামে গিয়ে নীলকর প্রজাদের দুর্গতি প্রত্যক্ষ করেছিল আঠারো শতকের আটের দশকে এবং সেই সময় ও গ্রামের প্রজাদের নীলজনিত দুরবস্থা যে সম্পূর্ণতঃ অপসৃয়মান হয়নি, আইনের দ্বারা বা নানা প্রতিরোধ গড়ে তোলা সত্ত্বেও নয়, তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, বিভূতিভূষণ তাঁর 'ইছামতী' উপন্যাসেও প্রায় একই সময়কে ধরে দেখান যে, এই দুর্গতি তখনও গ্রামে মোচিত হয়নি। এছাড়াও দেখি, ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন যে, দু একজন বাঙালির সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা। এখানে 'দু-একজন' বলতে মুষ্টিমেয় সংখ্যককেই বোঝানো হয়েছে। উপন্যাসে দেখি, বঙ্কিমের নবপ্রকাশিত বঙ্গদর্শন আনন্দময়ীকে পড়ে শুনিয়েছে বিনয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পর বঙ্কিম চারবছর বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেন।"১২৮৩-র বৈশাখ থেকেই বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যায়।..."

"এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালের বৈশাখ থেকে আবার বঙ্গদর্শন বের হল। এবার সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র।....সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদক ছিলেন ১২৮৪-র বৈশাখ থেকে ১২৮৯ সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত। এর মধ্যে ১২৮৬ সালে কোনো সংখ্যাই প্রকাশিত হয়নি। ১২৮৮ সালের আশ্বিন থেকে চৈত্র পর্যন্তও বন্ধ ছিল।..."

"..কিন্তু ১৩০৮-এর বৈশাখ মাস থেকে রবীন্দ্রনাথ সে পত্রিকার সম্পাদনা শু করলেন, তার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিও ছিল ভিন্ন।...."৯

এর আগে, ১২৯০-এর কার্তিক মাসে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কিন্তু মাত্র চার মাস চলেই তা বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে নানা সময়ে, যদিও বঙ্কিম আর সম্পাদনা করেননি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, উপন্যাসের ঘটনাধারাও তৎপূর্ববর্তী। আসলে বঙ্গদর্শনের সঙ্গে বঙ্কিমের নাম এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আসে, সম্পাদনা যিনিই কন পত্রিকাটি যে তাঁরই সৃষ্ট, সে কথা বার-বার ঘুরে-ফিরে আসে। আমাদের অনুমান,এই কারণেই সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনায় 'বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন' শব্দযুগল ব্যবহৃত, যদিও সময়টা ১৮৭৯-৮০, বঙ্কিম তখন সম্পাদনার দায়িত্বভার অপরের হাতে সমর্পণ করেছেন।

সময়টা যে, নিশ্চিত ১৮৭৯-১৮৮০ তার কারণ, সর্বজ্ঞ লেখকের এই বর্ণনা ঃ "পড়াশুনার খ্যাতিতে তাঁহার মেয়েরা তখনকার কালের সকল বিদূষীদের ছাড়াইয়া যাইবে বরদাসুন্দরীর মনে এই আকাঙ্খা ছিল। সুচরিতা তাঁহার মেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে মানুষ হইয়া এ সম্বন্ধে তাহাদের সমান ফললাভ করিবে ইহা তাঁহার পক্ষে সুখকর ছিল না। সেইজন্য ইস্কুলে যাইবার সময় সুচরিতার নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটিতে থাকিত।" এই প্রসঙ্গে সমালোচকের এই উক্তিও প্রনিধানযোগ্য ঃ

"It is worth noting that the first arts classes were started in the Bethune school in 1878 and the Eden Female School in Dacca was opened in the same year. The college classes in the former institution had only one student, namely Miss Kadambini Bose, and the Free church Normal school had another Chandra Mukhi Bose. In 1881 these were the only two pupils in the B.A. classes, attached to the Bethune School." 10

অর্থাৎ, বরদাসুন্দরীর মেয়েরা স্কুলে পড়ত এবং বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং, নানা সঙ্গতিসূত্র ধ'রে বলা যায় যে উপন্যাসের ঘটনা ১৮৭৮ পরবর্তী ১৮৭৯-'৮০। আর ১৮৮০-পরবর্তী হবার পক্ষেও বড় বাধা কেশবের রামকৃষ্ণ-আনুগত্য।

দুই

গোরা চরিত্রটির প্রত্যক্ষ যে কালপর্বটিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তার যথাযথ বৎসর লগ্নটিকে যেমন চিহ্নিত করা যায়, তেমনি মাসের পরিসীমাটি ও স্পষ্টত ঃ বোধগম্য হয়। এই মাস পরিসীমার প্রারম্ভের কাল-মুহূর্তটিকে উপলব্ধি করতে একেবারেই বিলম্ব হয় না। বিনা কাজের অবকাশে বিনয় দোতলার বারান্দায় একলা দাঁড়িয়ে কলকাতার রাজপথের কলকল্লোল দেখে। তখন শ্রাবণ মাস। এরপর বিনয়ের সঙ্গে পরেশবাবু তথা তার পরিবারের সকলের আলাপ ও তা থেকে তাদের বাড়ি অনায়াস যাতায়াত। গোরাও পরেশবাবুর বাড়ি একদিন গেছে এবং হারাণের সঙ্গে উত্তপ্ত তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছে। পনেরো পরিচ্ছেদে দেখি, আহারান্তে দুই বন্ধু উপরের ছাদে ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় মাদুর পেতে বসে আছে। "আহারান্তে দুই বন্ধু ছাতে আসিয়া মাদুর পাতিয়া বসিল। ভাদ্র মাস পড়িয়াছে; শুক্লপক্ষে জ্যোৎস্নায় আকাশ ভা

সিয়া যাইতেছে।" অর্থাৎ 'গোরা' উপন্যাসে প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে পনেরো পরিচ্ছেদ পর্যন্ত উপন্যাসে যে প্রত্যক্ষ সময়কে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা শ্রাবণ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত ব্যাপ্ত। একুশ পরিচ্ছেদে আছে, গোরা পরেশবাবুর বাড়ি থেকে ফেরবার পথে স্বাভাবিক দ্রুতগতি ত্যাগ ক'রে অন্যমনস্কভাবে মন্থর গতিতে প্রত্যাবর্তন করেছে। এই পরিচ্ছেদে প্রকৃতি ও গোরার প্রেমকে অদ্ভুত নৈপুন্যের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন এর স্রষ্টা। মানবপ্রকৃতির মধ্যে প্রেমের উন্মেষণ স্বাভাবিক, তার জাগরণ ঘটলে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি মিলতে বাধ্য। এখানেই রয়েছে সময়ের উল্লেখঃ "আজ এই হেমন্তের রাত্রে, নদীর তীরে, নগরের অব্যক্ত কোলাহলে এবং নক্ষত্রের অপরিস্ফুট আলোকে গোরা বিশ্বব্যাপিনী কোন্ অবগুণ্ঠিতা মায়াবিনীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইল!" অর্থাৎ পনেরো থেকে একুশ পরিচ্ছেদের ঘটনার কাল ভাদ্র থেকে কার্তিক—অগ্রহায়ণ পর্যন্ত। তারপর দিনই গোরা সঙ্কল্প করেছে যে তার কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে পায়ে হেঁটে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে গ্রাম ভ্রমণে বের হবে। কিন্তু অবিনাশ এবং বসন্ত অসুস্থ শরীরের অজুহাতে চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই তাকে ত্যাগ ক'রে কলকাতায় ফিরে এসেছে, আবার কয়েকদিনের মধ্যে মতিলালও বাড়ি থেকে অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে বিদায় নিয়েছে, কেবল রমাপতি থেকে গেছে (২৬ পরিচ্ছেদ)। এই সময় গ্রামে নাপিত গোরাকে তার পালিত মুসলমান সন্তানটির বিবরণ শোনাতে গিয়ে তার পিতা ফসর্দারের উল্লেখ ক'রে বলেছে ঃ "এবারে নদীর কাঁচি চরে চাষ দিয়া এ গ্রামের লোকেরা কিছু বেশি ধান পাইয়াছিল—আজ মাসখানেক হইল নীলকুঠির ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং আসিয়া লাঠিয়ালসহ প্রজার ধান লুঠ করে।" বোরো ধান চাষীরা ঘরে তোলে কার্তিক মাসের শেষে সুতরাং এ ঘটনা অগ্রহায়ণের। এরপরই গোরা ম্যাজিস্ট্রেট ব্রউন্ লো সাহেবের সঙ্গে সন্ধ্যার সময় দেখা করেছে এবং চরঘোষপুরের লোকদের অত্যাচারিত হবার বিবরণ শোনাতে চেয়েছে (২৭ পরিচ্ছেদ)। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাতের পর গোরা উকিলের সন্ধানে বের হয়েছে এবং তার বন্ধু সাতকড়ি উকিল যখন সাহায্য করতে চায়নি, তখন কোন উকিলের সাহায্যের জন্য কলকাতায় যাব স্থির করেছে। ঠিক তখনই ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে পাহারাওয়ালার সঙ্গে তার বিবাদ হয়েছে এবং তার জেল হয়েছে। অথাৎ, এ ঘটনাগুলি দিন দুয়েকের মধ্যেই ঘটেছে। কারণ, বেলা তিন-চার ঘটিকায় বিনয়, হারান এবং পরেশের কন্যারা যখন নাটকের রিহার্সালে প্রবৃত্ত তখনই গোরার জেলের সংবাদ তারা অবগত হয়েছে। ঠিক তখনই বিনয় সাতকড়ি উকিলকে সঙ্গে নিয়ে গোরার কাছে উপস্থিত হয়েছে এবং গোরা জামিনে ছাড়া পেতে প্রবলভাবে অসম্মত হওয়ায় সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। সেদিনই হারাণ ললিতা-সুচরিতা-বিনয়কে আগের দিনের কথা জানিয়েছে—"এই বলিয়া গতকল্য সন্ধ্যার সময় গোরার সহিত ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষাৎ বিবরণ এবং সে সম্বন্ধেতাঁহার নিজের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের আলাপের কথা বিবৃত করিলেন।" পরের দিন বিচারে গোরার এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে এবং সেই রাত্রেই বিনয় ও ললিতা স্টীমারে চড়ে পরেশবাবুর গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করেছে এবং পরের দিনই তারা সেখানে পৌঁচেছে (৩২ পরিচ্ছেদ)। একচল্লিশ পরিচ্ছেদে রয়েছে সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনা ঃ "এখন শীতের দিনে সন্ধ্যার সময় পরেশবাবু বাগানে যাইতেন না।" অর্থাৎ পৌষ মাস পড়ে গেছে, কিন্তু মাঘ মাস তখনও আসেনি। কেননা, চুয়াল্লিশ পরিচ্ছেদে দেখি, সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনা ঃ "আজ প্রায় পনেরো দিন হইয়া গিয়াছে ললিতা স্টীমারে করিয়া বিনয়ের সঙ্গে আসিয়াছে।" অর্থাৎ, একত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটে গেছে তা পনেরো দিনের। গোরার কারাদণ্ড ও পনেরো দিন হয়ে গেছে আরও পনেরো দিন বাকি আছে। তিপান্ন পরিচ্ছেদে গোরা কারাদণ্ড থেকে মুক্ত হয়েছে। সুতরাং পঁয়তাল্লিশ থেকে তিপান্ন পরিচ্ছেদ পনেরো দিনের ঘটনাকেই উপস্থাপিত করেছেন ঔপন্যাসিক। অর্থাৎ, তখন পৌষের শেষ, কিংবা মাঘ মাসের প্রারম্ভ। ষাট পরিচ্ছেদে সুচরিতাকে একলা দেখে পরেশ বলে উঠেছেন "এই ঠাণ্ডায় এত রাত্রে ছাতে"? অর্থাৎ, এই ঠাণ্ডা নিশ্চয়ই পৌষের শেষের অথবা মাঘের প্রারম্ভের। তিপান্ন থেকে ষাট পরিচ্ছেদের ঘটনা কয়েক দিনের মাত্র। একষট্টি পরিচ্ছেদে দেখি, মহিম অবিনাশের সঙ্গে তার কন্যা শশিমুখীর বিবাহ মাঘের পূর্ণিমা তিথিতেই দেব বলে স্থির করেছে এবং তা গোরাকেও জানিয়েছে। পঁচাত্তর পরিচ্ছেদে দেখি, কৃষ্ণদয়ালের অসুস্থতার কারণে পরশু দিনেই তার কন্যার বিবাহ দেব বলেছে, কেননা সেদিনেই বিবাহের দিন আছে জানিয়েছে। অর্থাৎ সে সময়ও মাঘ মাস এবং তখনই ঘটনার শেষ। সুতরাং, উপন্যাসে প্রত্যক্ষতকাল ঃ শ্রাবণ থেকে মাঘ তথা ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই-আগষ্ট থেকে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত—প্রায় সাত মাস সময়কে ধরা হয়েছে।

তিন

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে অবিচ্ছেদ্য ধারা, তারই অপর নাম জীবন এবং সেই জীবনে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যজনকভাবে এক 'হ্যাঁ'-এর জগতে, এক চূড়ান্ত সদর্থক ভাবনায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। জীবনের নঙর্থক দিক তাঁকে বিচলিত হয়তো করেছিল কোন কোন সময়, কিন্তু কখনোই বিহ্বল করতে পারেনি, কোন নেতিবাদ তাঁকে আক্রান্ত করতে পারেনি। মানুষের সম্বন্ধে তার অব্যর্থ অপরাজেয় দিক সম্বন্ধে তাঁর অখণ্ড ও সবল বিশ্বাস ছিল। কালের পিছুটানকে তাঁর অতন্দ্র দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেনি তা নয়। বাস্তবতার সমতলতা তো বটেই, উচ্চাবচ উপলবন্ধুরতাকেও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, জীবনের বহুমুখিতা—তার কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্র-বর্হির্মুখী শক্তি তাঁর অজাড্য দৃষ্টিকে স্পর্শ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ব্যক্তির ক্রমবিকাশশীলতা, তার 'হয়ে ওঠা', তার 'being থেকে 'becoming' -এর দিকে যাওয়া উপজীব্য হলেও সেই ব্যক্তি শ্রেণীর চৈতন্যবিচ্যুত নয়। লুসিয়ঁ গোল্ডম্যান 'Conscience possible' -এর কথা বলেছিলেন, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি নয়, ব্যক্তি যে শ্রেণীর অংশীদার, সেই শ্রেণীর ভবিষ্যৎগামিতাও সুচিহিত হয় উপন্যাসের মতো শিল্প-মাধ্যমে। উপন্যাস যেহেতু খণ্ডিত ও সমগ্র চৈতন্যের দ্বন্দ্বমথিত রূপকেই ধারণ করে, তার একাধারে থাকে শ্রেণীর অর্জিত অভিজ্ঞতার নানামাত্রিক রূপ, অন্যাধারে থাকে জটিল-অজটিল, বিন্যস্ত-অবিন্যস্ত, অভিপ্রেত-অনভিপ্রেত বহু স্তরবিন্যাস। তাই অথর যে টেক্সট গড়ে তোলেন তাকে কালহীন ক'রে দেখা যায় না, আবার তাতেও তাঁর কোন কর্তৃত্ব নেই এমন মনে করাও সম্পূর্ণতঃ যায় না। তাই রোলাঁ বার্থের সেই প্রবাদপ্রতিম উক্তি ঃ "the birth of the reader must be at the cost of death of Author"—এ কথা মনে রেখেও বলা যায় যে, যে কালকে লেখক ধরছেন, সেই কালকে জ্ঞাতসারে তিনি পরিস্ফুট ক'রে তুলতে আগ্রহী। কিন্তু একইসঙ্গে যে কালে বসে লেখক লিখতে বসেছেন, সেই কালটিও সংজ্ঞান বা অসংজ্ঞানে সেই ক্যালেণ্ডার মানা কালটির মধ্যে প্রবেশ করে। একইসঙ্গে, পাঠক যখন সেই টেক্সট নিজস্ব দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে বসে তখনও এক বিশেষ কালখণ্ডে গড়ে ওঠা মন দিয়ে তার বিচারে প্রয়াসী হয়। টেক্সট বিচার কালে লেখক যেমন রিয়েলিটি গ্রহণ বা বর্জনের দ্বারা উপন্যাসের রিয়েলিটি গড়ে তোলেন, তেমনি যে সময়ে বসে তিনি তা গড়ে তোলেন সেই সময়টিও নানাভাবে উক্ত রিয়েলিটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। আর নতুন এক রিয়েলিটির মুখোমুখি হয়ে আগের রিয়েলিটির সত্যতাকে পুনর্নির্মাণ করে পাঠক। সুতরাং যে কোন উপন্যাসে এই ত্রয়ী কালকে উপেক্ষা করা যায় না কখনো।

আর তাই, যদিও গোরা চরিত্রটি দ্বিস্তরীয় কালখণ্ডের সৃষ্ট, তবুও পাঠকের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে এসে পড়ে আরও এক কালখণ্ড।

অর্থাৎ 'গোরা' উপন্যাসে প্রত্যক্ষ সময়ের অন্তরালে রয়েছে বৃহত্তর সময়ের পরিচয়। এই বৃহত্তর সময়কে ঔপন্যাসিক সচরাচর ফ্ল্যাশ ব্যাক বা ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ডের সাহায্যে ধরেন। 'গোরা' উপন্যাসে রয়েছে এই ফ্ল্যাশব্যাকের ব্যবহার। শ্রদ্ধেয় সমালোচক বলেছেন ঃ ''উপন্যাসটিতে বর্ণিত কাহিনীর প্রকাশ্য বা প্রত্যক্ষ সময়স্তর (ছ'মাসের সময়সীমা) হ'ল গোরার যৌবনকাল অর্থাৎ উনিশ শতকের আশির দশক। কিন্তু এর নেপথ্যে উপন্যাসটির আরেকটি কালস্তর আছে—সেটি সিপাহী বিদ্রোহের সূচনাকাল অর্থাৎ ১৮৫৭ বা তার কাছাকাছি সময়।''১১ ফ্ল্যাশব্যাকের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ এই যে পরোক্ষ সময়সীমাকে ধরেছেন তা গোরা চরিত্রের ক্ষেত্রে সিপাহী বিদ্রোহের সমকালীন সময়, কিন্তু 'গোরা' উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা আরওপূর্বের—হরিমোহিনীর কাহিনী গোরার জন্মেরও আগেকার এবং তারও আগেকার কাহিনী হল পরেশ বা কৃষ্ণদয়ালের। কৃষ্ণদয়াল তেইশ বছর বয়সে গৃহ ছেড়ে পশ্চিমে যাত্রা করেন এবং ছয় মাসের মধ্যে পুনরায় বিবাহ করেন। সেখানে চাকরি পেয়ে ও নানা উপায়ে নিজের প্রতিপত্তি ক'রে নেন। সুতরাং, উপন্যাসের ভিন্ন কালস্তরটি সিপাহী বিদ্রোহের সূচনাকাল নয়, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ নয়, উনিশ শতকের প্রায় বিশের দশক। পরেশবাবু ও কৃষ্ণদয়ালের সমকালীন। উনিশ শতকে বাঙালিরা গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে যেতে চায়নি, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে গতানুগতিকতাকে চুরমার ক'রে দিতে সচেষ্ট হয়েছিল। অনেকেই এতে সামিল হয়েছিল, বিদ্রোহের-বিপ্লবের-জেহাদের দলে মিশে অতিরঞ্জিত আচরণ করেছিল, সকলেই আসলে মনে প্রাণে, চৈতন্য দিয়ে তাতে শরিক হননি। কৃষ্ণদয়াল ও পরেশ তার নিদর্শন, যাঁরা পরবর্তীতে দুই বিপরীতে মের বাসিন্দা। যাইহোক, উপন্যাসের প্রত্যক্ষ সময়ে কোন বিরতি নেই, প্রতিনিয়তই অজস্র ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তীব্র নাটকীয়তাকে বা আকস্মিকতাকে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। তাই দেখি, প্রায়শই ঘটনাধারার সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য ফ্ল্যাশব্যাককে উপস্থাপিত করেছেন। পরেশ, কৃষ্ণদয়াল, হরিমোহিনীর কাহিনীর এই কারণেই অবতারনা। তাছাড়া মহৎ উপন্যাসে থাকে মুখ্য ও গৌণ চরিত্রের প্রতি ঔপন্যাসিক তথা স্রষ্টার সমান মনোযোগ।

প্রত্যক্ষ সময়ের ঘটনাধারায় যেমন গোরা, বিনয়, সুচরিতা, ললিতা, আনন্দময়ী, পরেশকে এনেছেন, তেমনি ফ্ল্যাশ ব্যাকের সাহায্যে হরিমোহিনী, কৃষ্ণদয়াল প্রমুখকে উপস্থাপিত করেছেন এবং সময়ের ক্ষেত্রেও সাম্যাবস্থা স্থাপিত হয়েছে। আবার দেখি, উপন্যাসে যে সব ঘটনা ঘটে, চরিত্ররা তাদের কার্যধারা গতিবিধি চালচলনের দ্বারা যা প্রাণবন্ত করতে চায়, সেই ঘটনার ও চরিত্রের স্থান-কাল বেষ্টিত যে ক্ষেত্র তাই উপন্যাসের পটভূমি। অর্থাৎ উপন্যাসের ঘটনা যে সময়ে ও যে স্থানে ঘটে, চরিত্ররা যে সময়ে ও যে স্থানে অবস্থান করে সেই সুনির্দিষ্ট সময় কাঠামোটি, সেই সুনির্দিষ্ট স্থানিক পরিমণ্ডলটি উপন্যাসের পটভূমি (Setting)।কিন্তু সেই পটভূমি যখন সামাজিক পরিস্থিতি ও পরিমণ্ডলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়, এক বৃহত্তর স্থান ও সময়কে চিহ্নিত করে, ব্যক্তিগত ছোট সময় নয়, ইতিহাসের বড় সময়কেই চিনিয়ে দেয়, তখনই তা প্রতিবেশ বা milieu-এর মর্যাদা পায়। উপন্যাসের চরিত্ররা নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ নিঃসন্দেহে, কেবল গোরা নয়, হারান সুচরিতা ললিতা পরেশ আনন্দময়ী প্রত্যেকেই তাদের প্রত্যক্ষজীবন অতিবাহিত করেছে কলকাতা নামক নগরটিকে কেন্দ্র ক'রে, কিন্তু কেবল ঐ স্থান বা তাদের ব্যক্তি সময় নয় তারা যেন প্রত্যেকেই এক বৃহত্তর সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করেছে, বিশেষ সময়ের শরিক হয়েও বড় সময়ের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের জীবনের ছোট-খাট ঘটনা, মানবিক অনুভূতির খণ্ড-বিখণ্ড প্রকাশ ইতিহাসের বৃহত্তর সময়, যা কেবল setting নয়, milieu-কেও চিনিয়ে দিয়েছে।

চার

রবীন্দ্রনাথের মতো প্রাজ্ঞ ও মেধাবী স্রষ্টা দেশের মূল শক্তি কেবল কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট নগরের মধ্যে দেখেননি। কলকাতায় ছেলেবেলায় ঠাকুরবাড়ির চৌহদ্দিতে খড়ির গণ্ডির মধ্যে তাঁর প্রাণ হাঁফিয়ে উঠত, কিন্তু কলকাতার বাইরের জগতকে মনোরঞ্জনের জন্য বা ভ্রমণের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষভাবে পরখ ক'রে দেখেন নি। বিশ শতকের ঠিক আগেই, উনিশ শতকের শেষ দিকে জমিদারী পরিচালনার সূত্রে শিলাইদহে গ্রাম-পরিক্রমা করেছিলেন এবং গ্রাম-সম্বন্ধে, তাদের মানুষজন সম্বন্ধে নানা তীক্ষ্ম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। বিশ শতকের প্রারম্ভে, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করলেন মূলত তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করার জন্য। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্তিমলগ্নে রবীন্দ্রনাথ মর্মে-মর্মে অনুভব করেছিলেন যে, উচ্ছ্বাসের গ্ন অসুস্থ পথ কোন চূড়ান্ত গন্তব্যে উপনীত হতে সাহায্য করে না। তাই, শান্তিনিকেতনের স্তিমিত শান্ত-শ্রীমণ্ডিত পরিমণ্ডলে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর অন্তরের নিভৃত কথাটিই প্রকাশ ক'রে ফেলেছিলেন তিনি ঃ

"বিদায় দেহো ক্ষম আমায় ভাই
কাজের পথে আমি তো আর নাই।...
তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে
সে সব মিছে হয়েছে মোর কাছে—
পারি নে আর চলতে সবার পাছে।"১২

ন্যাশানালিজম্ -এর ধারণা, ভারতবর্ষের যে বৃহৎ রূপ তা কেবলমাত্র হিন্দু-পুনর্জ্জীবনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। প্রকৃত মানবধর্ম সংকীর্ণ নয়, উদার; পক্ষপাততুষ্ট নয়, নিরপেক্ষ; কোন ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ হয় না, বৃহত্তর চিন্তার দ্বারা আপন ক'রে নেয়; তা কেবলই আক্রমণ করে না, অবাঞ্ছিতকেও সয়ে যাবার অপার সহনশক্তি অর্জনে সাহায্যে করে। ধর্ম হল মানুষের ধর্ম, সংকীর্ণ জাতীয়তা নয়, তা বিশ্বমানবতা। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথ সরে এলেন তাঁর পূর্বের মত ও পথ থেকে, হিন্দু জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতাকে উপলব্ধি ক'রে। এই উপলব্ধি তাঁর সাহিত্যজীবনের মধ্যাহ্নকালের, জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এই সদর্থক বিশ্বাসকেই তিনি লালন করেছিলেন। তাঁর সাতচল্লিশ বছর বয়সে উপন্যাসটির শু এবং দু'বছর ধরে উপন্যাসটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ তাঁর উনপঞ্চাশ বছর বয়সেউপন্যাসটির শেষ। অর্থাৎ, বিশ শতকের প্রারম্ভের রবীন্দ্রনাথের যে উপলব্ধি তথা জীবনদর্শন তা ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকেই অর্জন করেছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র গোরা।

"আমাদের পূর্বপুষের সেই নিয়ত-জাগ্রত মঙ্গলের ভাবটিকে হৃদয়ের মধ্যে প্রাণবৎরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের সর্বত্র তাহাকে প্রয়োগ করি, তবেই বিপুল হিন্দু-সভ্যতাকে পুনর্বার প্রাপ্ত হইব। সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধনসম্পদদান, ইহা আমাদের নিজের কর্ম; ইহাতেই আমাদের মঙ্গল—ইহাকে বাণিজ্যহিসাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য

ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা না করা, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত কর্মযোগ, এই কথা নিয়ত স্মরণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব। স্বার্থের আদর্শকেই মানবসমাজের কেন্দ্রস্থলে না স্থাপন করিয়া, ব্রহ্মের মধ্যে মানবসমাজকে নিরীক্ষণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব। ইহাতে পশু হইতে মনুষ্য পর্যন্ত সকলেরই প্রতি কল্যাণভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া যায় এবং নিয়ত অভ্যাসে স্বার্থ পরিহার করা নিশ্বাসত্যাগের সময় সহজ হইয়া আসে। সমাজের নীচে হইতে উপর পর্যন্ত সকলকে একটি নিঃস্বার্থ কল্যাণবন্ধনে বাঁধা, ইহাই আমাদের সকল চেষ্টার অপেক্ষা বড়ো চেষ্টার বিষয়। এই ঐক্যসূত্রেই হিন্দুসম্প্রদায়ের একের সহিত অন্যের এবং বর্তমানের সহিত অতীতের ধর্মযোগ সাধন করিতে হইবে। আমাদের মনুষ্যত্বলাভের এই একমাত্র উপায়।"১৩

প্রথম পর্বের গোরার উক্তিও রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের মতাদর্শের অনুরূপ।

"সমস্ত বিশ্বের জ্ঞানশক্তি প্রাণশক্তি তাকে ভিতরে বাহিরে কেবলই আঘাত করছে, আমরা যে যতই ছোটো হই সেই জ্ঞানের দলে প্রাণের দলে দাঁড়াব, দাঁড়িয়ে যদি মরি তবু একথা নিশ্চয় মনে রেখে মরব যে আমাদেরই দলের জিত হবে—দেশের জড়তাকেই সকলের চেয়ে বড়ো এবং প্রবল মনে করে তারই উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকব না।"

অর্থাৎ, প্রথম পর্বের গোরার প্রবল স্বাজাত্যবোধ স্বয়ং স্রষ্টার। হিন্দুত্বকে ও ভারতবর্ষীয়তাকে সদৃশ ক'রে দেখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তিনি, ভারতবর্ষকে ভালবাসা আর সনাতন ধর্মের জন্য আনন্দ অনুভব করা একই সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল তাঁর কাছে। 'হিন্দু'-কে 'নেশন' রূপে গড়ে তোলার প্রবল স্বপ্ন বিরাজ করেছিল তাঁর নিভৃত অন্তরে। কিন্তু স্বাজাত্যবোধের, বিশেষত : স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের বিকারগ্রস্ত পথ দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ মঙ্গলজনক নয়, রবীন্দ্রনাথের লালিত আদর্শ দ্বারাও পরিচালিত নয়। কাজের পথের নানা অন্তরায় তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, জাতিদাঙ্গা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল, তাই ১৩১৪ বঙ্গাব্দ থেকেই তিনি দেশ সম্পর্কে, তার মানুষজনের সম্পর্কে নতুন ভাবনায় ভাবিত হলেন, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিচারে প্রয়াসী হলেন। 'প্রবাসী' ১৩১৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'তপোবন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ "ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে স্পন্দিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করচে, দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন নানাদিক থেকে আমাদের বারম্বার ব্যর্থ হতে হবে।" আর উপন্যাসের অন্তিমকালে গোরা আনন্দময়ীকে দেখে বলে উঠেছে ঃ "মা তুমিই আমার মা।....তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"

রবীন্দ্রনাথের মতো গোরা সামাজিক নানা অসংগতিকে প্রত্যক্ষ করেছে, শিষ্যের দল যখন তাকে পূজা করতে চেয়েছে তখন তাদের মূঢ়তা তাকে যন্ত্রণাদগ্ধ করেছে। এই তীব্র কষ্ট, বেদনা তথা মুমুক্ষুতা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে সে, নিজের অসম্পূর্ণতাকেও জেনেছে, আর তা জেনেছে দেশের মানুষের সঙ্গে মিশে, সুচরিতার সংস্পর্শে এসে এবং নিজের জন্মরহস্য অবগত হয়ে। আর তখনই সে ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপের সন্ধান পেয়েছে, যে রূপ তারস্রষ্টার মনেও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

প্রসঙ্গত আরও একটি কথা। গোরা চরিত্রের সম্পূর্ণতা আনার জন্য সমাজের সংকীর্ণতাকে উপস্থাপিত করেছেন, অসীম মনোযোগ দিয়ে এঁকেছেন এককালের কালাপাহাড়, বর্তমানের প্রগাঢ় রক্ষণশীল কৃষ্ণদয়ালকে, মধ্যবিত্ত চতুর মহিমকে, আপাত অনাসক্ত কিন্তু তীব্র সংসার আসক্ত হরিমোহিনীকে, লোলুপ বিষয়ী কৈলাসকে। আবার পরক্ষণেই ব্রাহ্মধর্মের রক্ষকতণ ভণ্ড 'প্রগতিশীল' পানু ওরফে হারাণকে, লালক বরদাসুন্দরীকে—তাদের ত্রোধ, খবরদারি করার প্রবণতা তথা রক্ষণশীলতাকে। সংযত সুচরিতা, মধুর ললিতা, মমতাময়ী আন্দময়ী, আর কল্যাণকামী পরেশ—প্রত্যেককেই নিরাসক্ত শিল্পীর আর সেনসিবিলিটি থেকে অঙ্কন করেছেন এরস্রষ্টা। আর এদের কণ্ঠস্বরও গোরাকে 'হয়ে উঠতে' সাহায্য করেছে, তাকে সমগ্র ক'রে তুলেছে।

অর্থাৎ, গোরা শুধু তার জন্ম সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেনি, ভবিষ্যৎ সময়েরও প্রতিভূ স্বরূপ আবির্ভূত হয়েছে। তার মধ্যে আগামী দিনের, সময় অতিত্রমী অভিজ্ঞানকে সংযোজিত করেছেন এরস্রষ্টা। তাই দেখি, একদিকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের দ্বারা তাড়িত হয়েছে সে, আবার সেই ভাবনার শূন্যচারিতাকেও প্রত্যক্ষ করেছে। অর্থাৎ এতো একদিকে এক বিশেষ পর্বের ভারতবর্ষীয় নাগরিকের চিন্তাভাবনার অসঙ্গতির প্রতিবেদন অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনব্যাপী যে দর্শনে বিশ্বাস রেখেছিলেন তার প্রতিফলনও বটে। অর্থাৎ, আমাদের দেশের উনিশ-বিশ শতাব্দীব্যাপীইতিহাসকে, দুই শতাব্দীর জাতীয়

জীবনকে একটিমাত্র চরিত্রের মধ্যে গেঁথে দিয়েছেন, যা যাদুঘরের সামগ্রী নয়, একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও যার প্রাসঙ্গিকত া হারিয়ে যায় নি। সুতরাং, গোরা এক বিশেষ পর্বের ইতিহাস থেকে উত্থিত হয়েছে, কিন্তু কোন সীমাবদ্ধ সময়ে সে অ াটকে থাকেনি, সে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মিলিত সমাহার, যাবতীয় আত্মবিরোধের স্পর্শরহিত, রবীন্দ্রনাথের চৈতন্য থেকে জাগরিত, আমাদের স্বপ্নের-কল্পনার-আদর্শের যথার্থ প্রতিভূ।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১. ‘গোরা’ উপন্যাসসংক্রান্ত উদ্বৃতিগুলি ‘রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ’, ঋিভারতী গ্রন্থনবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ (বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত বই থেকে নেওয়া।

২. 'On the Bengali Renaissance', Susobhan Sarkar, Papyrus, july 1985, page-45

৩. Ibid, page-46

৪. ‘বাঙালী জীবনে রমনী’, নীরদচন্দ্র চৌধুরী

৫. 'On the Bengali Renaissance', Susobhan Sarkar, papyrus july 1985, page-45

৬. ‘বাংলা দেশের ইতিহাস’—৩য়; রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৩৭৮ (বঙ্গাব্দ) পৃষ্ঠা-১৮২।

৭. ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’ সপ্তম খণ্ড, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৯২ পৃষ্ঠা-৬১।

৮. ‘রবীন্দ্র উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে’, ভূদেব চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৫৪।

৯. ‘বঙ্গদর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের ও তারপরে’, ভবতোষ দত্ত, ‘বঙ্গদর্শন’, সম্পাদক সত্যজিৎ চৌধুরী, জুন ২০০০, পৃষ্ঠা ১৯-৪৩।

১০. 'Heroines of Tagore', B. B. Majumdar, Firma K.L. Mukhopadhyay, 1968, page-226

১১. ‘রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প’, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে’জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৫১।

১২. ‘বিদায়’, ‘‘খেয়া’ কাব্যগ্রন্থ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্ররচনাবলী ১০, ঋিভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃষ্ঠা-১৫০

১৩. ‘ভারতবর্ষীর সমাজ’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (শ্রাবণ ১৩০৮এ লেখা), রবীন্দ্র- রচনাবলী ত্রয়োদশখণ্ড (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা ৪৩,

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com